৯. গিল্ড বা সমবায় সঙ্ঘ

প্রাচীন ভারতে বাণিজ্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বৃত্তির মানুষের যে পেশাদারী সংগঠনের আবির্ভাব হয় তাকে বলা হয় গিল্ড বা সমবায় সঙ্ঘ। শ্রেণী ও নিগম নামেও তা পরিচিত। কবে ও কিভাবে এর উদ্ভব তা সঠিক ভাবে জানা যায় না। তবে মনে করা হয় কারিগর ও শ্রমিকশ্রেণী ধনী মালিকদের অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার জন্য ও অধিকতর সুযোগ-সুবিধার আশায় সমবায় সঙ্ঘ গঠন করে। কারিগর ও শ্রমিক ছাড়াও সৈনিক, পুরোহিত, এমনকি চোরদেরও অনুরূপ সঙ্ঘ ছিল। যে পরিবারগুলি বংশানুক্রমিকভাবে বাণিজ্যের একটি নির্দিষ্ট শাখাকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেছিল তারা কোনো এক নেতার অধীনে যৌথ সংস্থা গঠন করে। অপরদিকে বংশপরম্পরায় ও পারিবারিকভাবে কোনো কারিগর একটি নির্দিষ্ট শিল্পে বিশেষ নৈপুণ্য অর্জন করলে, সেও তার সমবৃত্তির মানুষের সঙ্গে কোনো নেতার অধীনে সমবায় সঙ্ঘ গঠন করত।

সমবায় সঙ্ঘ গঠনের একটি প্রয়োজনীয় উপাদান শিল্পের স্থানীয়করণ। জাতকের গল্প থেকে জানা যায় কোনো নগরের একটি রাস্তায় বা একটি গ্রামে শুধু এক বৃত্তির কারিগরই বাস করত। যেমন কাম্মারগামে প্রায় এক হাজার কর্মকার পরিবার ও মহাবদ্ধকিগামে সমসংখ্যক কাঠের ব্যবসায়ী বাস করত। উভয় ক্ষেত্রেই নেতা বা জেথ্থিকের অধীনে তারা সঙ্ঘবদ্ধ হত। কারিগর, শ্রমিক ও বণিকদের সমবায় সঙ্ঘগুলি তাদের এই সম্মিলিত মনোভাব থেকে আত্মমর্যাদা লাভ করত। রাষ্ট্রের দিক থেকেও এই সঙ্ঘের মাধ্যমে কর আদায় ও শিল্প পরিচালনার সুবিধা হত।

বৈদিক সাহিত্যে সমবায় সঙ্ঘের অস্পষ্ট উল্লেখ আছে। বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র ও জাতকে গুরুত্বপূর্ণ নগরগুলিতে বাণিজ্য ও শিল্পের সঙ্গে যুক্ত সমবায় সঙ্ঘের কথা বলা হয়েছে। চারটি বৃত্তির সমবায় সঙ্ঘের নাম বৌদ্ধ সূত্রে পাওয়া যায়— দারুশিল্পী, চর্মশিল্পী, ধাতুশিল্পী ও চিত্রকর শ্রেণী। সঙ্ঘগুলির নিজস্ব প্রধান ও স্বতন্ত্র নিয়মকানুন ছিল। তারা রাজকীয় শোভাযাত্রায় অংশ নিত। রামশরণ শর্মার মতে রাজার পক্ষে ভাণ্ডাগারিক সমবায় সঙ্ঘগুলির তত্ত্বাবধান করত। কিন্তু এর ফলে তাদের স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হয়নি। রাজার আদেশ পালনে রাজি না হয়ে গ্রামশুদ্ধ দারুশিল্পীরা রাতারাতি অন্যত্র চলে গেছে, এমন দৃষ্টান্তও পাওয়া গেছে।

সমবায় সঙ্ঘের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রাচীনতম লেখটি মৌর্যোত্তর যুগের। কারিগররা সেই সময় রাজার অনুগত কোনো প্রধানের অধীনে সংগঠিত হত। খ্রীঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে সাতবাহন রাজ্যে সাধারণ বৌদ্ধরা মৃৎশিল্পী, তৈলশিল্পী ও তন্তুবায় সমবায় সঙ্ঘে রৌপ্য মুদ্রা জমা রাখত। সেখান থেকে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করা হত। সম্ভবত সঙ্ঘগুলি তাদের কাছে জমা রাখা অর্থে কাঁচামাল ও উপকরণ ক্রয় করতে এবং পণ্যদ্রব্য বিক্রির অর্থ থেকে সুদ দিতে পারত। মৌর্যোত্তর যুগে আঠারোটি চিরাচরিত সঙ্ঘ ছাড়া মহাবস্তু আরও এগারো রকম কারিগরের উল্লেখ করেছে। তারা রাজগৃহ, শাকল, সাঁচী, ভারহুত ও পশ্চিম দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে বাস করত। শেষোক্ত অঞ্চল থেকে রোমের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যের ফলে তাদের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়।

গুপ্তযুগের স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতে সমবায় সঙ্ঘগুলির ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে বিশদ নিয়মাবলীর উল্লেখ আছে। তারা যৌথচুক্তি সম্পাদন, ব্যবসা পরিচালনা ও অর্থ জমা রাখার মতো কাজ করত। এছাড়া সঙ্ঘের সদস্যদের বিচার সংক্রান্ত ও প্রশাসনিক কর্তব্যাদিও তারা সম্পাদন করত। তারা মুদ্রা ও সীলমোহর প্রচলন ও 'শ্রেণীবল' নামে নাগরিক সেনাদলও গঠন করে। গুপ্তযুগে সমবায় সঙ্ঘগুলির স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার ছিল ও তাদের সিদ্ধান্ত রাজাও মেনে নিতেন। তবে ক্ষেত্রবিশেষে সঙ্ঘের কাজে রাজার হস্তক্ষেপ করারও অধিকার ছিল। সঙ্ঘগুলির রাষ্ট্রবিরোধী, অনৈতিক ও অপরাধমূলক কাজে রাজা অবশ্যই বাধা দিতেন। এ থেকে মনে হতে পারে অর্থনৈতিক জীবনে সমবায় সঙ্ঘগুলির প্রতিপত্তি এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের পক্ষে ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

দামোদর ধর্মানন্দ কৌশাম্বী মনে করেন রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতের দূরপাল্লার বাণিজ্যেরও অবসান হয়। আঞ্চলিক ভিত্তিতে দ্রব্য বিনিময়ের মাধ্যমে নতুন এক ধরনের বাণিজ্য গড়ে ওঠে ও নতুন এক বণিক শ্রেণীর উদ্ভব হয়। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পুরনো সমবায় সঙ্ঘগুলি ভেঙে পড়ে। সঙ্ঘের সদস্যবর্গ গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে ও বর্ণভিত্তিক উৎপাদক গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু সমকালীন সীলমোহর, লেখ ও স্মৃতিশাস্ত্রগুলির সাক্ষ্যে রমেশচন্দ্র মজুমদার ও উপেন্দ্রনাথ ঘোষালের মতো ঐতিহাসিকগণ সেযুগে সমবায় সঙ্ঘগুলির অস্তিত্বের পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। আধুনিক গবেষণায় দেখা গেছে গুপ্ত-পরবর্তী অর্থাৎ আদি মধ্যযুগে সমবায় সঙ্ঘগুলি ক্রমে দুর্বল হতে থাকে ও এর সংগঠন ও কার্য বলীতেও পরিবর্তন দেখা দেয়। লালনজী গোপাল মনে করেন সঙ্ঘের সদস্যদের স্বাতন্ত্র্যবৃদ্ধি সমবায়সুলভ সংগঠনের দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত করে। কার্যত আদি মধ্যযুগে সমবায় সঙ্ঘ ও জাতি সমার্থক হয়ে যায়। ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় দেখিয়েছেন একটি সমবায় সঙ্ঘ একই বৃত্তির কারিগরদের সংগঠন আর থাকল না। ফলে একই বৃত্তিতে একাধিক নেতা ও সংগঠনের উদ্ভব ঘটে। ভক্তপ্রসাদ মজুমদারের মতে এযুগে ভূস্বামীদের উত্থান ঘটায় কারিগর ও শ্রমিকদের বড়ো অংশই ভূস্বামীর এলাকায় নিযুক্ত হয়। ফলে

সমবায় সঙ্ঘগুলির শিল্পসংক্রান্ত কাজ চালাবার জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম ও শ্রমিকের অভাব দেখা দেয়। এখন লোকে সমগ্র সমবায় সঙ্ঘের কাছে অর্থলগ্নী না করে, লগ্নী করে সঙ্ঘের প্রধানের কাছে। অতএব রাজকীয় হস্তক্ষেপ, সঙ্ঘের বর্ণে রূপান্তর, সঙ্ঘে অর্থলগ্নীর বিরলতা সমবায় সঙ্ঘের অবক্ষয়ের সূচনা করে।

সমবায় সঙ্ঘের কার্যাবলী থেকে মনে হতে পারে যে এগুলি শুধু নিজেদের সদস্যদের পেশাগত স্বার্থ রক্ষা করত। কিন্তু লেখ সূত্রে জানা যায় সমবায় সঙ্ঘ কোনো একটি সূর্য মন্দির নির্মাণ করে সেখানে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের ব্যবস্থা করে। এই দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায় সমবায় সঙ্ঘগুলি শুধু দেশের শিল্প, কারিগরী বিদ্যা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতিবিধানই করেনি। রাষ্ট্র তাদের যে ক্ষমতা ও স্বাধীনতা দিয়েছিল তার দ্বারা তারা একদিকে যেমন রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক শক্তির অন্যতম কেন্দ্র হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিল, অপরদিকে সংস্কৃতি ও প্রগতিরও পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠেছিল।